সম্পাদকীয়

রক্ষা করতে চাই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি

কাজের জন্য সারা দেশ ঘুরতে ঘুরতে দেখেছি, আমরাই একমাত্র জাতি যারা নিজের ভাষা বলতে লজ্জা পাই। অন্যভাবে বলা যায়, বাংলা ভাষা নিয়ে আমরা কোনো গর্ববোধ করি না। বেশিরভাগ বাবা-মা নিজেদের ছেলেমেয়েকে ইংরিজি মাধ্যম স্কুলে পড়ান। আর বেশ আনন্দের সঙ্গে বলেন, আমার ছেলে বাংলাটা ভালো বলতে পারে না বা মেয়েটা বাংলা লিখতে পারে না। এটা নিজেদের দৈনতাকে প্রকাশ করা। আমার প্রশ্ন স্বামী বিবেকানন্দ বা রাজা রামমোহন রায় কোন ইংরিজি মাধ্যমে লেখাপড়া করেছিলেন? বা রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দর পড়াশোনা কোন মাধ্যমে ছিল? তাঁরা বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়া করে ইংরিজিতে কীভাবে এত দক্ষ ছিলেন?

আর একবার ভাবুন তো আজ বাংলা ভাষা ভুলে যাচ্ছি, কাল আমরা বাংলা সংস্কৃতি ভুলে যাব। এরপর আমরা হয়তো নিজেদের বাবা-মাকে ভুলে যাব, মাতৃভূমিকে ভুলে যাব। কিন্তু মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে কোনো জাতি এগোতে পারে না।

তাই, আমরা কয়েক জন বন্ধু মিলে উদ্যোগ নিয়েছি বাংলা ভাষার একটা পত্রিকা বের করার। যার মাধ্যমে তুলে ধরা হবে বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য। নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা চর্চায় ফিরিয়ে আনাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা চাই আপনাদের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা। আসুন আমরা সবাই হাত মিলিয়ে রক্ষা করি বাংলার সংস্কৃতি ও কৃষ্টি।

সূচিপত্র

মণীষীদের রঙ্গ রসিকতার	৩-৪
সাতকাহন	
কৌতুকী	৫
গল্প	৬
কবিতা	৭-৮
অডিও বুক	৯
বই নিয়ে মজার কথা	১০
স্বাস্থ্য	১১-১২
জনস্বাস্থ্য	১৩-১৪
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	১৫
আইনি পরামর্শ	১৬-১৭
ভ্রমণ	১৮-২০
পরিবেশ	২১-২২
ইতিহাসের খোঁজে	২৩
হেঁসেল	২৪
রূপলাগি	২৫
শপিং গাইড	২৬
মণীষীদের কথা	২৭-২৮
সংস্কৃতি	২৯
বিনোদন	৩০

রূপকথা

প্রথম বর্ষ, প্রস্তুতি সংখ্যা

সম্পাদক
মানসকুমার ঠাকুর
সহযোগী
সবুজ ও রাই
অক্ষরবিন্যাস
ইন্দ্রবুবলি
প্রচ্ছদ
কুন্তল

মনীষীদের রঙ্গ রসিকতার সাতকাহন

করোনাকালে মন খারাপ শরীরের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। সকলের মনেই যেন এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব। তাই বিশেষজ্ঞদের নিদান, মন ভালো রাখার সেরা উপায় হল সব সময়ে রঙ্গ ও রসিকতায় মজে থাকুন। কিন্তু সমস্যা হল, বাংলা সাহিত্য এমনকী চলচ্চিত্র থেকে হাসির উৎস, রঙ্গ, কৌতুক ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষ যেন হাসতে ভুলে গেছে। অথচ এক সময়ে বাংলার মনীষীরা ছিলেন রসে টুইটুম্বুর। এই দুঃসময়ে মন ভালো রাখতে মনীষীদের তেমনই কিছু রসিকতার কথা এখানে তুলে ধরা হল।

রবীন্দ্রনাথের রসিকতা

দাড়িশ্বর

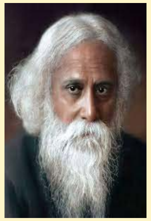

একবার রবীন্দ্রনাথ এক গানের আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যখন সেখানে যান, তখন সেখানে ধ্রুপদ গাইছিলেন শিল্পী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর গান শুনে কবি মুগ্ধ। গোপেশ্বরের গান গাওয়া শেষ হলে উদ্যোক্তারা কবির কাছে এসে অনুরোধ করেন, 'গুরুদেব, এবার আপনাকে গাইতে হবে।' সেদিনের অনুষ্ঠানে কবি গিয়েছিলেন একজন শ্রোতা হিসাবে। উদ্যোক্তাদের অনুরোধে কবি হাসতে হাসতে বলেন, 'বুঝেছি বুঝেছি, গোপেশ্বরের পর এবার দাড়িশ্বরের পালা, তাই তো?' রবীন্দ্রনাথের মুখে এই কথা শুনে সভায় হাসির রোল উঠল।

পাদুকাপুরাণ

একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখা করতে গিয়েছিলেন। ঘরে ঢুকে তিনি দেখলেন, রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ফরাসে জমিয়ে বসেছেন। শরৎচন্দ্র আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে গুরুদেবকে প্রণাম করলেন। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, শরৎচন্দ্রের হাতে কাগজে মোড়া কিছু একটা জিনিস। কৌতুহল চেপে রাখতে পারলেন না কবি। শরৎচন্দ্রের কাছে জানতে চাইলেন, 'ওহে শরৎ, তোমার হাতে কাগজে মোড়া ওটা কী'? শরৎচন্দ্র হেসে উত্তর দিলেন, 'গুরুদেব, এটা হচ্ছে পাদুকাপুরাণ'।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রসিকতা

চরিত্রহীন

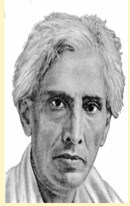

তখন সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের খুব নাম। তাঁর 'শ্রীকান্ত', 'দেবদাস' প্রভৃতি বই হট কেক। সেই সময় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে আর এক লেখকের আবির্ভাব হয়। এই শরৎচন্দ্র 'চাঁদমুখ', 'হিরের ফুল' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা ও 'গল্পলহরী' পত্রিকার সম্পাদক। স্বভাবতই দুই শরৎচন্দ্রের মধ্যে নামবিভ্রাট দেখা যায়। পাঠকদের অবশ্য বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না কোনটা কার লেখা। এই সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর এক ছেলেবেলার বন্ধুর দেখা। অনেকদিন পরে দু'জনের দেখা হয়েছে। শরৎচন্দ্র বন্ধুকে

বলেন, 'কী হে চিনতে পারছ না বুঝি? আমার নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।' বন্ধুটিও বেজায় রসিক। বললেন, 'আজকাল বাংলা সাহিত্যের আকাশে তো দু'জন শরৎচন্দ্রের উদয় হয়েছে আপনি কোন জন?' বন্ধুর রসিকতা বুঝলেন শরৎচন্দ্র। তিনি হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, 'চরিত্রহীন'। জবাব শুনে বন্ধু হো-হো করে হেসে ওঠেন।

স্যার আশুতোষের রসিকতা

মনোমালিন্য

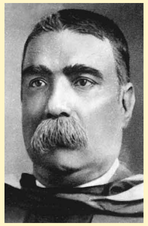

একদিন সকালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঘরে বসে তৃপ্তি করে এক থালা সন্দেশ খাচ্ছিলেন। এক ভক্ত তাঁর সামনে গেলেন। স্যার আশুতোষ তাঁকেও অনুরোধ করেন, 'ওহে সন্দেশ খাও'। ভক্তটি একটি সন্দেশ মুখে পুরে খেতে খেতে বলেন, 'স্যার, শুনলাম আপনার সঙ্গে নাকি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মনোমালিন্য হয়েছে? এটা কি ঠিক কথা?' আশুতোষ সন্দেশ খেতে খেতেই বলেন, 'এ সব কথা কে বলল? আমি আমার ছেলেদের নামের মধ্যে প্রসাদ জুড়েছি, উনি নিজের পুত্রদের নামের মধ্যে আমার তোষ ঢুকিয়েছেন। এতেও মনে হয় দু'জনের মনোমালিন্য হয়েছে?' এই উত্তর শুনে ভক্তটি হেসে উঠলেন ও আরো একটা সন্দেশ খেতে শুরু করলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রসিকতা

রথ দেখা কলা বেচা

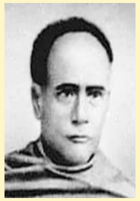

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন বিদ্যালয়ের পরিদর্শক। কাজের জন্য তাঁকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যেতে হত। একবার এক বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গিয়ে ক্লাসে ঢুকে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। দেখেন, শিক্ষক মশাইয়ের টেবিলে একটা লম্বা বেত রাখা। বিদ্যাসাগর শাসনের নামে ছাত্র প্রহার পছন্দ করতেন না। তাই টেবিলে বেতটি দেখে তিনি মনে মনে বড়ই রুষ্ট হন। শিক্ষককে ডেকে বিদ্যাসাগর বলেন, 'বেতটি দিয়ে কী কাজ হয় শুনি?' কাঁচুমাচু মুখে ওই শিক্ষক বলেন, 'ছাত্রদের ম্যাপ দেখানোর জন্য বেতটি এনেছি।' তখন গম্ভীর মুখে বিদ্যাসাগর বলেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি। রথ দেখা, কলা বেচা, দুটো কাজই হবে। বেত দিয়ে ছাত্রদের প্রহার করা যাবে আবার ম্যাপ দেখানোও যাবে। কী, তাইতো? ঈশ্বরচন্দ্রের কথা শুনে লজ্জা পেয়ে যান ওই শিক্ষক। সত্যি বেরিয়ে গেছে যে। সেদিন থেকে তিনি বেত পরিত্যাগ করেন।

শুঁড়তোলা চটি

বিদ্যাসাগরের শুঁড়তোলা চটির দিকে একবার আঙুল তুলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বললেন, পন্ডিতমশাই, আপনার চটির শুঁড় তো দেখছি ক্রমশই উপরের দিকে উঠছে। দেখবেন, শেষ মাথায় গিয়ে না ঠেকে। ঘরশুদ্ধ লোক সাহিত্য সম্রাটের কথায় হেসে ওঠেন।

দাদা ঠাকুরের রসিকতা

কন্যাদায়

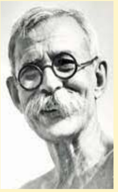

শরৎচন্দ্র পন্ডিত একবার আদালতে গেছেন এক সেরেস্তাদারের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে আদালতে আসতে দেখেই উকিল, মুহুরি, মোক্তাররা এগিয়ে এসে বললেন,

'ঠাকুরমশাই, আপনার কেস আমি এখনই করে দিচ্ছি, আসুন'। ভিড়ের চাপে দাদাঠাকুর এগোতেই পারেন না। তখন বুদ্ধি খাটিয়ে বলেন, 'আমি কন্যাদায়গ্রস্ত গরিব ব্রাহ্মণ। কিছু সাহায্যের জন্য এসেছি আপনাদের কাছে।' এই কথা শুনে ভিড় ফাঁকা। রাস্তা পরিষ্কার। দাদাঠাকুর সোজা চলে গেলেন সেরেস্তারের ঘরে।

ট্যাঁকে টাকা

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পন্ডিত ট্যাঁকে বা চাদরের খুঁটে পয়সা রাখতেন। একজন তাঁকে বলেন, 'আপনি আয়রন চেস্টে টাকাপয়সা রাখেন না কেন?'

উত্তরে দাদাঠাকুর বলেন, 'বুঝলে না, যাদের চেস্ট আয়রনের মতো, তাঁরাই আয়রন চেস্টে টাকা রাখে।'

দাদাঠাকুরের জবাব শুনে লোকটা হেসে ফেলেন।

পদস্থ

দাদাঠাকুর একবার বেতার কেন্দ্রের এক পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে যান। তাঁর পরনে চিরাচরিত পোশাক, ধুতি ও চাদর। তাঁকে ওইভাবে আসতে দেখে এক কর্মকর্তা হন্তদন্ত হয়ে কাছে এসে বলেন, 'দাদাঠাকুর, আপনি আমাদের কাছে যেভাবে খুশি আসুন, তাতে অসুবিধা নেই। কিন্তু ওনারা সব পদস্থ ব্যক্তি, ওনাদের সামনে এইভাবে এলে কী ভাববে বলুন তো?'

দাদাঠাকুর সব শুনে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলেন, 'বটে। তা ওনারা আবার পদস্থ কোথায় হে? ওরা তো দেখছি জুতোস্থ। পদস্থ বলতে তো দেখছি শুধুই আমি।' এই কথা শুনে ওই কর্মকর্তা চুপ করে যান।

কৌতুকী

পরীর মতো মেয়ে

শিবরাম চক্রবর্তী

এই প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট! সেই ডাকসাইটে (নাকি ডাকিনীসাইটে) জায়গা? মহানগরীর নাগর সংস্কৃতির পীঠস্থান? প্রেমের কতটা ছয়লাপ হয় এখানে জানিনে, কিন্তু চাঁদের ছড়াছড়ি দেখি চারধারেই!

সুহৃদ্বরকে সম্বোধন করলাম, 'এ যে একেবারে প্রমীলা রাজ্যে এনে ফেললে হে!'

বাড়িতে বাড়িতে বারান্দায় বারান্দায় সারি সারি মেয়েরা। এরা কি সব বারাঙ্গনাই? ঘরদোর আনাচকানাচ উপচে রাস্তায় এসে পড়ছে পরীর দল। দারুণ পরিস্থিতি!

রাজপথ না বলে রানীপথ বলাটাই বুঝি সঠিক। এবং যাবপর নাই পরাস্ত হবার পানিপথ বুঝি সবার জন্যেই। অলিন্দে অলিন্দে ফুটন্ত ফুল। গলিতে গলিতে উৎফুল্ল অলি। অলিগলি যদি বলি তো একেই বলা যায় বোধ করি। ওরই ভেতরে একটি মৌচাকে সুহৃদ্বর আমায় নিয়ে সেঁধুলেন। খুপরিতে খুপরিতে মক্ষিরানী। তারই একটা কামরায় বসলাম গিয়ে আমরা। আঠারো-উনিশ বয়সী বোধ হয় মেয়েটি। কচি কচি মুখ। দেখলে মায়া করে।

আমাকে বন্ধু বলে সুহৃদ তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। সমভাবেই সে খাতির করছিল দুজনকে। ভারী ভদ্র মেয়েটি। বন্ধুর অনুরোধে খানকয়েক গানও গাইল সে। সুরেলা মিষ্টি গলা। চা বিস্কুট এল- তিনজনেই খেলাম। বেশ খানিক গল্পগুজবের পর আমরা চলে এলাম সেখান থেকে। আসার আগে সুহৃদ মেয়েটির হাতে কিছু টাকা দিয়েছিল মনে আছে।

'চেনা চেনা বলে যেন মনে হল মেয়েটাকে।' বললাম বাইরে এসে।

'ও-তাই!' সমঝদারের মতো সে হাসল-'তাই বলো। বুঝলাম এবার।'

'কী বুঝলে?'

'পরীর মতো মেয়ে দেখলে এরকমটা মনে হয় বটে। মনে হয় যেন কতকালের পরিচিত। স্বভাবতই এমনটা হয়। না হয়ে পারে না। সবারই হয়ে থাকে'। সে হাসে আবার। (সংগৃহীত)

স্মরণীয় লেখকের বরণীয় গল্প

পরিচয়

বনফুল

আমাকে চিনতে পারছ?

-পারছি বই কি?

-কী করে পারলে? চেনবার তো কথা নয়।

-বাঃ, আমি দেখেছি যে। একবার নয় অনেকবার।

-কী করে দেখলে? আমি তো এখানকার নই। কলকাতা থেকে আমাকে এখানে এনেছে। আমাকে ঠিক নয় আমার মা-কে। আজই ফুটেছি আমি। তুমি কি কলকাতা গিয়েছিলে কখনো?

-না, ওই যে গাছে আমার বাসা। টুনটুনি উড়ে গিয়ে তার বাসাটির চারপাশে ঘুরে এল একবার। মালতী ফুল সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। টুনটুনি আবার এসে বসল, তার কাছে। বলল, তুমি যাই বল, তোমাকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি। মাঝে মাঝে আসব তোমার কাছে, কেমন?

ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে গেল সে।

-এই যে ভালো আছ?

-আছি।

-তুমি চেন নাকি আমাকে?

-বাঃ চিনি না? চিরকাল তোমায় দোলাচ্ছি, চিরকাল তোমার সুরভি, তোমার পরাগ নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছি।

-কিন্তু আমি তো এখানকার লোক নই। ভাবছি কী করে চিনলে।

-আমি কি এখানকার নাকি? কাল রেঙ্গুনে ছিলাম, আজ এখানে এসেছি। তার আগে ছিলাম ওড়িশায়। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই আমি।

আমরা কারো নই অথচ সকলের।

-হাওয়া তাকে দুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।

-আমি তোমাকে চিনি।

যে আলো তাকে ঘিরেছিল, কথা কয়ে উঠল।

-আমি কলকাতারও নই, ঢাকারও নই। আমি আকাশের আর তুমি মাটির। আমি আকাশ থেকে নেমে এসেছি। মাটিতে তোমাকে ফোটাব বলে। এই পরিচয়ের বাঁধনেই আমরা চিরকাল বাঁধা। আমাদের অন্য কোনো পরিচয় নেই।

আলোর হাসি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নতুন স্বপ্ন জাগল মালতি ফুলের পাপড়িতে। হাওয়া আবার দোল দিয়ে গেল। টুনটুনি পাখি আবার এসে বসল পাশের ডালটিতে।

আমি কি তোর প্রেমে পড়েছি

প্রদীপ আচার্য

চলে যেতে যেতে ভুল স্টেশনে
মেট্রো থেকে নেমে পড়েছি
আমি কি তোর প্রেমে পড়েছি?
গত একমাসে সমস্ত কাজে
কোনো না কোনো ভুল করেছি
আমি কি তোর প্রেমে পড়েছি?
ঘোর বর্ষায় আগুনরাঙা
কৃষ্ণচূড়ার গান ধরেছি
আমি কি তোর প্রেমে পড়েছি?
ক্যামেরা হাতে জন-অরণ্যে
তোর মুখটাই ফ্রেমে ধরেছি
আমি কি তোর প্রেমে পড়েছি?
তোকে ক'পলক দেখব বলেই
জিওগ্রাফির ক্লাস করেছি
আমি কি তোর প্রেমে পড়েছি?
একবার তোর ফোনের আশায়
কতবার মিসড কল করেছি
হ্যাঁ আমি তোর প্রেমে পড়েছি
হ্যাঁ আমি তোর প্রেমে পড়েছি।

আজ শুধু তোমার জন্য

তনুশ্রী চক্রবর্তী

দেখা হল সেই কোণ নদীটার পাড়ে
নামটি যেন অনেক কালের চেনা
সব কিছু তার হারিয়ে পাওয়া ধন
মনের মাঝে সুর বাজে একটানা।।
প্রভাত হতে ঢের বাকি রোজ রাতে
কথার মালা ঝরবে নীরব সুরে
একটুখানি থামলে সংগোপনে
ঝনঝনিয়ে উঠবে হৃদয়পুরে।।
চিত্ত যখন আকুল হবে জেনো
হৃদয় হিসাব হবে এলোমেলো
তোমার লেখা এগিয়ে দিয়ে কেউ
বলবে, ঘরে আসছে দেখো আলো!
তোমার আছে বুকভরা এক কথা
ফেরি করার নেই তো আড়ম্বর
বাঁধছ যে সুর সুরবালার হাতে
নতুন জয়ের গন্ধ লেখার পর।।
সে কথা তো হয় না বুঝি শেষ
শান্ত মনেও কথার মালিকা
পড়ছি আমি পড়ছ তুমি বুঝি
আঁকা কথার সেবক-সেবিকা।।

ভয়

প্রদীপ চন্দ্র

ছায়াতলে বসে ছায়া দেখেছি আমি
দিনেরও ক্লান্তি আসে দেখি প্রতিদিন
নিস্তব্ধ অসাড় সব যেন মূর্ত মরুভূমি;
তবুও অসীম আশা মরীচিকা ক্ষীণ।
চারিদিকে অহরহ শুধু প্রতিধ্বনি
আছে তবু সংশয় কি জানি কি হয়
অচেনার ভান করি যারে আমি চিনি
অজানা আগন্তুকের কবে হবে ক্ষয়।
বৃন্তচ্যুত কত ফুল কে রাখে হিসাব
মহামারী, হানাহানি কে দেবে বিদায়
আগামীর কান্না শুনি শিক্ষার অভাব
দৃষ্টিপথ গ্রাস করে বর্তমান হায়।
বিষাক্ত সাগর যেন মলাটে ঢাকা
জীবনের কবিতা আজ ব্যর্থ মনে হয়
রজনী শুধুই কালো, বিষণ্ন বিভীষিকা
আশা আর অপেক্ষার মাঝে কিছু নয়।

বিষণ্ন শর্বরী

প্রশান্ত ভট্টাচার্য

চোখ ঢাকলে অমানেশায় গাইতে পারি
দুঃখজাগানিয়া
ঘুমের ঘোরে মনসায়রে ভাসিয়ে দিতে
যাবত দেয়ানেয়া
শব্দহীন কথার যানে পেরিয়ে গেলে
ব্যক্তিগত মেরু
গাছের গায়ে রক্ত ফোটে তবুও বলি
কাঁদছ মিছে ভীরু
রূপসায়রে স্বপ্ন নিয়ে নামছে দেখো
স্বর্গবাসী সেই যে অহংকারী
রাতজামাটা সরিয়ে ফেল দেখবে কত
ফুল ফুটেছে বিষণ্ন শর্বরী

বর্তমান

মানসকুমার ঠাকুর

মন খারাপ করে
থেমে থেকো না -
এগিয়ে যাও
শরীর ও মনে।
এখন তুমি পারবে না
এড়িয়ে যেতে -
এগিয়ে যেতে সময়, সংস্কার ও স্বাতন্ত্রকে
পারবে না -
ভুলে যেতে -
বিশ্বাস ও অবিশ্বাসকে।
এই সময়টা সময়ের জন্য
খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
মনটাকে স্থির কর,
মনটাকে বুঝিয়ে দাও -
সে যেন চাওয়া ও পাওয়ার
ব্যতিক্রমী -
পৌরুষ ও সংযমী।
তোমার কাজে -
যেন কোনো ক্লান্তি না থাকে,
না থাকে সংশয়,
দৃষ্টি স্থির ও প্রত্যয়।
মন খারাপ করে
থেমে থেকো না,
এগিয়ে যাও
শরীর ও মনে।

অডিওবুকে প্রিয় লেখকদের গল্প শোনার অভিজ্ঞতা

storytel

প্রিয় লেখকদের গল্প পড়তে কার না ভালোলাগে? কিন্তু ব্যস্ততার যুগে মানুষের হাতে পড়ার সময় ও ধৈর্য্য নেই। উপায় একটাই অডিওবুক এর মাধ্যমে প্রিয় লেখকদের গল্প শুনতে পারেন। আর এই সুযোগ এনে দিল স্টোরিটেল। স্টোরিটেল ২০২০ সালে সিলেক্ট পরিষেবার পাইলট প্রকল্প চালু করেছিল শুধুমাত্র মারাঠি ভাষায় কয়েক হাজার অডিওবুক আর ইবুক নিয়ে। এবার এই সাবস্ক্রিপশন ১১টা ভাষায় ছড়িয়ে দেওয়া হল। এবার গল্প শোনা যাবে বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, উর্দু, তামিল, মালায়ালাম, তেলেগু, অসমিয়া, গুজরাটি, উড়িয়া , কন্নড় প্রভৃতি ভাষায়। গ্রাহকরা ২ ভাবে এই গল্প শোনার সুযোগ পেতে পারেন। ‘সিলেক্ট’-এ ১৪৯ টাকায় গ্রাহক হলে আঞ্চলিক ভাষায় গল্প শোনার সুযোগ পাবেন। আর ‘আনলিমিটেড’ এ গ্রাহক হলে ২৯৯ টাকার বিনিময়ে গ্রাহকরা শুধুমাত্র ভারতীয় ভাষায় অডিওবুকের পাশাপাশি ইংরিজির প্রিমিয়াম আন্তর্জাতিক বইগুলোও শোনার সুযোগ পাবেন।

বইপ্রেমী আর সাহিত্যপ্রেমীরা স্টোরিটেল অ্যাপে অনেক জনপ্রিয় বই পাবেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রাইকান্তর মত ক্লাসিক থেকে শুরু করে জনপ্রিয় অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের গলায় এখনকার বেস্টসেলার ‘বিন্দু বিসর্গ’ পর্যন্ত। অনেক বিখ্যাত শিল্পী তাঁদের কন্ঠে গল্প পড়েছেন। যেমন হিমাদ্রীকিশোর দাশগুপ্তের ‘এবারো ভয়ঙ্কর’ পড়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা রজতাভ দত্ত, ‘অ্যালকেমিস্ট’ পড়েছেন ঋতব্রত মুখার্জি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার বই ‘সাগর থেকে ফেরা’ পড়েছেন বরুণ চন্দ। স্টোরিটেল দে’জ পাবলিশিং, পত্রভারতী, দেব সাহিত্য কুটীর, ও বাংলার আরো অনেক সেরা প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। শীর্ষেন্দু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বাণী বসুর মত সর্বকালের বেস্ট-সেলিং সাহিত্যিক থেকে শুরু করে প্রচেত গুপ্ত, দেবারতি মুখোপাধ্যায় আর অভিজ্ঞান রায়চৌধুরীর মত এখনকার লেখক, বাংলা সাহিত্যের সেরা লেখকদের বহু বই আপনি এখানে পাবেন। স্টোরিটেল ইন্ডিয়ার কান্ট্রি ম্যানেজার যোগেশ দশরথ বলেন,‘আমাদের লক্ষ্য মানুষকে তাঁদের শিকড় থেকে উঠে আসা গল্প ও সাহিত্যের আরো কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া।’

সংস্থার সদর দফতর স্টকহোম, সুইডেন। এই মুহূর্তে পৃথিবীর ২৫টা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। ভারতে এখন এই অ্যাপে ১২টা ভাষার ২ লাখের বেশি অডিওবুক আর ইয়ারবুক রয়েছে। স্টোরিটেল গুগল প্লে স্টোর এ গেলে যাবতীয় বিষয় জানতে পারবেন।

বই নিয়ে মজার খবর

১. হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে ৪ খানা বই আছে যা মানুষের চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা।

২. মাথা পিছু বই পাঠের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে আইসল্যান্ড।

৩. বই পড়া মানুষের অ্যালজাইমার রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম।

৪. ব্রাজিলের কারাগারে প্রতি একটি বই পাঠের জন্য ৪ দিন সাজা মুকুব হয়।

৫. ভার্জিনিয়া উল্ফ তাঁর সব বই দাঁড়িয়ে লিখেছিলেন।

৬. সবচেয়ে চুরি হয় যে বইটি সেটি হল বাইবেল।

৭. রুজভেল্ট প্রতিদিন গড়ে ১টি করে বই পড়তেন।

৮. শুধুমাত্র দাবা খেলার উপরই ২০০০০’য়ের বেশি বই আছে।

৯. ভিক্টর গুগোর লা মিজারেবল বইয়ে একটি বাক্য আছে যেখানে ৮২৩টি শব্দ।

১০. হারি (ল্কম্প্ন), এডিকশন (ট্রান্ঞ্জক্ষন্স্প্স) এসব শব্দ শেক্সপিয়ারের আবিষ্কার।

১১. নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরির সব বই একসঙ্গে লাইন করে রাখলে ৮ মাইল লম্বা হবে।

১২. লেভ টলস্টয়ের বিশাল উপন্যাস ওয়ার অ্যান্ড পিসের পান্ডুলিপি তাঁর স্ত্রী হাতে লিখে ৭ বার কপি করেছিলেন।

১৩. নোয়াহ ওয়েবস্টার তাঁর প্রথম ডিকশনারি লিখতে সময় নিয়েছিলেন ৩৬ বছর।

১৪. বঙ্গীয় শব্দকোষ নামে অভিধানটি তৈরি করতে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় লেগেছিল প্রায় গোটা জীবন। সেইসঙ্গে ছিল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই।

১৫. পৃথিবীতে একটি মাত্র বই আছে যা অনেক চেষ্টা করেও কোনো ভাষায় অনুবাদ করা যায়নি। বইটি সুকুমার রায়ের লেখা আবোল তাবোল।

১৬. মহাভারত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বই বা মহাকাব্য যার মধ্যে ১২০০’র বেশি চরিত্র আছে।

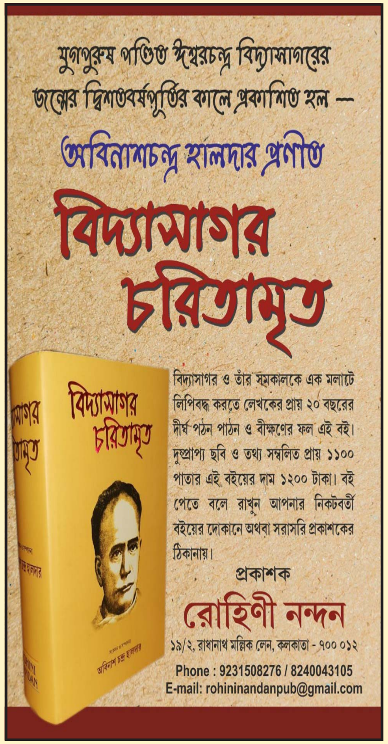

পিঠের ব্যথাকে অবহেলা নয় হতে পারে স্পাইন টিবি

পিঠে ব্যথা এমনিতে খুবই সাধারণ সমস্যা। অনেকে প্রথমদিকে তেমন গুরুত্ব দেন না। তবে এই সমস্যা বেশিদিন শরীরে পুষে রাখা ঠিক নয়। বিশেষ করে যদি কয়েকদিন বিশ্রামে থাকার পরেও ব্যথা কমার বদলে বেড়ে চলে, যন্ত্রণায় রাতের ঘুম চলে যায় তাহলে তড়িঘড়ি ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। কারণ এই উপসর্গ শিরদাঁড়ায় টিবির কারণে হতে পারে। এই রোগ নিয়ে জানালেন স্পাইন সার্জেন **ডাঃ আবরার আহমেদ**

কৌন বনেগা ক্রোড়পতির প্রথম সিরিজের ঠিক আগের ঘটনা। ওই সময় বিগ বির বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। তার মধ্যে ছিল, পিঠের অসহ্য ব্যথা ও সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর চরম ক্লান্তি। তিনি একটুও দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। পরীক্ষায় জানা যায়, তিনি মেরুদণ্ডের টিবিতে আক্রান্ত। শুরুতে অসুখ ধরা পড়ার জন্য ও উপযুক্ত চিকিৎসায় বছর খানেকের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠেন সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন।

এই অসুখ হতে পারে আমার, আপনার যে কারোর। এই মুহূর্তে ভারতে প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ লোক এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এমনকী ৩ লাখ মানুষ এই অসুখের জন্য মারা যাচ্ছেন। এখনও অনেকের ধারণা, টিবি শুধু ফুসফুসে হয়। আসলে টিবি হতে পারে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, মোট টিবি রোগীদের মধ্যে ৫-১০ শতাংশ হাড় বা বোন টিবিতে আক্রান্ত, আর ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে বোন টিবি এফেক্ট করে মেরুদণ্ডে।

স্পাইন টিবির লক্ষণ কী

শিরদাঁড়ায় টিবির উপসর্গ শুরু হয় পিঠে ও মেরুদণ্ডের ব্যথা দিয়ে। এরপর বাড়তে থাকে ব্যথার প্রকোপ। সাধারণত পিঠে ব্যথা কিছুটা সময় বিশ্রাম নিলেই সেরে যায়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তা হয় না। বরং দিনে দিনে যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। ব্যথার জন্য শোয়া, বসা কষ্টকর হয়। রাতে ঠিকমতো ঘুম হয় না। প্রাথমিক অবস্থায় যদি চিকিৎসা শুরু না করা হয় তাহলে ধীরে ধীরে হাত-পা অবশ হয়ে যায়। চলাফেরার অসুবিধা হয়, কোনো কিছুতে নিয়ন্ত্রণ থাকে না। পরে প্যারালাইসিস পর্যন্ত হয়ে যায়।

কারা আক্রান্ত হতে পারে

শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক যে কারোর এই অসুখ হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু করা দরকার। তা নাহলে মেরুদণ্ডে স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। কোনোরকম পিঠে ব্যথা হলে ফেলে না রেখে এটা সেটা চেষ্টা বা প্রয়োগ না করে বা ইচ্ছেমতো ওষুধ না খেয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

রোগ নির্ণয়ে কী কী পরীক্ষা দরকার

পিঠে বা শিরদাঁড়ায় ব্যথার কারণ যে স্পাইনাল টিবি তা নিশ্চিত হতে সাধারণভাবে রক্ত পরীক্ষা, লিভার ফ্যাংশন টেস্ট, সিআরপি, ইএসআর, এক্স-রে বা দরকার হলে এমআরআই টেস্ট করানো হয়।

কীভাবে চিকিৎসা করা হয়

অসুখ ধরা পড়লে প্রথমে অ্যান্টি-টিউবারকিউলোসিস ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া খেতে হয় প্রচুর পরিমাণে টাটকা ফল, সবজি, হাই প্রোটিন ডায়েট। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্পাইনাল ব্রেস পরতে হতে পারে। সব সময় পুরোপুরি বিশ্রামের দরকার হয়। তা নাহলে রোগ জটিল আকার নিতে পারে। হাতে-পায়ে প্যারালাইসিস ছড়িয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে দরকারে অপারেশন করতে হতে পারে। অপারেশন করে টিবি সংক্রমিত হাড় বের করা হয়। মেরুদণ্ডের কোনো সমস্যা হলে তা কারেকশন করা হয়। ফলে মেরুদণ্ডের কোনো সমস্যা খুব স্বাভাবিক ভেবে অবহেলা করা উচিত নয়।

বর্ষায় কী খাবেন ?
কী খাবেন না ?

প্রকৃতিপ্রেমী হিসাবে সবার পছন্দ ঋতুরানি বর্ষা। অতিবর্ষণ কিছু সমস্যা তৈরি করলেও বর্ষাকে সবাই উপভোগ করে। এই উপভোগেই খানিক অসতর্কতায় দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে বর্ষায় খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে। বর্ষা যাতে বিরক্তির কারণ না হয়ে দাঁড়ায় সেজন্য পুষ্টিবিজ্ঞানীরা কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। এই সময়ে কী খাবেন না আর কী খাবেন মেনে চলুন সেসব।

শাকসবজি

যদিও সবুজ শাকপাতা জাতীয় খাবার শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর, তবু বর্ষায় এই ধরনের খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। বর্ষার সময় শাকপাতা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। বর্ষাকালীন পোকামাকড়ের সঙ্গে জীবাণুও এতে লেপ্টে থাকে।

জীবাণুমুক্ত না করে এসব শাকপাতা খেলে তা পাকস্থলীর জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। তার থেকে ডায়েরিয়া ও খাদ্যে বিষক্রিয়ারও আশঙ্কা থেকে যায়। একান্তই যদি খেতে হয় শাক রান্নার আগে লবণ দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে।

সামুদ্রিক মাছ

সামুদ্রিক যে কোনো মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া বর্ষায় না খাওয়াই ভালো। এই সময়ে সামুদ্রিক প্রাণী বংশবিস্তার করে। কেউ খেতে চাইলে একেবারে তাজা খেতে হবে। বাসি খেলে পেটের রোগ ডেকে আনবে।

তৈলাক্ত খাবার

যে কোনো সময়ই তৈলাক্ত খাবার পাকস্থলীর জন্য ক্ষতিকারক। এমনকী স্বাস্থ্যের জন্যও তাই। সবসময়ে এই তৈলাক্ত খাবারে আসক্তি থাকলেও বর্ষায় বিশেষভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ বর্ষায় শরীর পর্যাপ্ত জল ধরে রাখতে পারে। অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবার জলের সঙ্গে মিশতে না পেরে পাকস্থলীতে বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

এই সময়টায় বিশেষত তিল ও সরিষার তেল এড়িয়ে ভুট্টা ও জলপাইয়ের তেল খাবার তালিকায় রাখা ভালো।

ফলের রস

বর্ষায় কোনো ধরনের ফলের বা সবজির রস খাওয়া ভালো নয়। বিশেষ করে বাইরের তৈরি জুস। যদি একান্তই খেতে হয়, তবে বাড়িতে বানিয়ে খেতে পারেন। বর্ষায় ফলের রস, কুলফি, ঘোল, আখের রস, দই জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন।

প্রায়ই খাবার গরম করা যাবে না

বর্ষায় জীবাণু দ্রুত ছড়ায়। শুনতে অবাক লাগলেও ঘন ঘন খাবার গরম করলে জীবাণু খাবারে জন্ম নেয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে খাবার রান্নার পর তাড়াতাড়ি সেই খাবার খেয়ে ফেলতে হবে।

বাইরের খাবার এড়িয়ে যেতে হবে

ফুটপাত, হোটেল সহ বাইরের খাবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপরিষ্কার জল ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে করা হয়। এক্ষেত্রে সেসব খাবারে বেশি জীবাণু থাকে। বাসি খাবারই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগ ছড়ানো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের জন্ম দেয়। তাই বাড়িতে তৈরি খাবারের চেয়ে নিরাপদ আর কিছু নেই। খাবারের তালিকায় ফল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বা ভিটামিন এ, সি, ই ও ফলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার রাখতে হবে।

কাঁচা খাবার

যে কোনো কাঁচা খাবার বর্ষায় না খাওয়া ভালো। বর্ষায় এই ধরনের খাবার জন্ডিস, টাইফয়েডের সম্ভাবনা বাড়ায়।

কী খাবেন

গরম স্যুপ

বর্ষায় খাওয়ার জন্য খুব ভালো হল, সবজির গরম স্যুপ। পুষ্টিতে ভরপুর স্যুপ শুধুই ঠান্ডা লাগা ও জ্বরই কমাবে না, শরীরে জলের সঠিক মাত্রা বজায় রেখে স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

চা

ইনফ্লুয়েঞ্জা কাটাতে চা বিশেষ করে হার্বাল চা খুব ভালো। হজমের জন্য অসাধারণ কাজ দেয়।

শুকনো খাবার

জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে বলে বর্ষায় শুকনো খাবার খেতে হবে বেশি করে। এতে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, ঝরঝরে থাকবে শরীর।

পরিষ্কার জল

বর্ষায় শরীরে জীবাণু ছড়াতে অপরিষ্কার জল প্রধান শত্রু। তাই বাইরের জল এড়িয়ে যেতে হবে। যথাসম্ভব জল ফুটিয়ে খান।

আমন্ড বাদাম

আমন্ড বাদাম খুব পুষ্টিকর খাদ্য। এর মধ্যে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম, প্রোটিন, জিঙ্কের মতো ১৫টা পুষ্টিকর উপাদান। আর রয়েছে ভিটামিন ই। যা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ রোধ করে। ভিটামিন-ই তে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। যা ফুসফুসের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়। আমন্ড বাদাম আপনি যেকোনো সময়ে স্ন্যাকস হিসাবেও খেতে পারেন।

হলুদ

সবচেয়ে কার্যকরী মশলা হলুদ। এর মধ্যে রয়েছে ক্যালসিয়াম, ফাইবার, আয়রন, জিঙ্কের মতো ৩০০টার বেশি পুষ্টিগুণ। হলুদে রয়েছে প্রদাহ প্রতিরোধ গুণ যা রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়। এছাড়া হলুদে অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টি ফাংগাল, অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল গুণ রয়েছে, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধক শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এখন করোনা পরিস্থিতিতে খুব কার্যকরী হলুদ। হলুদ আপনি দুধের সঙ্গে বা ঘি এর সঙ্গে গোলমরিচ মিশিয়ে খেতে পারেন। খুব উপকার পাবেন।

সবশেষে এটাই বলার বর্ষা উপভোগ করুন, কিন্তু শরীর বাঁচিয়ে।

সোনা রেখে ঋণ নিতে চাইলে

মানসকুমার ঠাকুর

সোনা শুধুমাত্র মেয়েদের অলংকার নয়, অসময়ের বন্ধু। নানা সময়ে ছোটো বড়ো দরকারে সোনা বন্ধক রেখে ধার নেওয়া যায়। এর জন্য বিশেষ কাঠখড় পোড়াতে হয় না। তবে বাড়ি ঋণ, গাড়ি ঋণ-র মতো সব শব্দ যতটা পরিচিত, স্বর্ণ ঋণ ততটা নয়। এর একটাই কারণ, এই ঋণ সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি না। খোঁজ রাখি না।

স্বর্ণ ঋণ কী

সোজা কথায়, সোনা ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্ক নয় এমন প্রতিষ্ঠানের কাছে জমা রেখে, তার বদলে ঋণ নেওয়াকে স্বর্ণ ঋণ বলা হয়।

সোনা বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়ার সুবিধা কি কি

- অন্যান্য ঋণের মতো কাগজপত্র জমা দিতে হয় না।
- ব্যক্তিগত ঋণ পেতে বা বাড়ি প্রভৃতি বন্ধক রেখে ধার নিতে যতখানি সময় লাগে, স্বর্ণ ঋণে তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগে।
- সাধারণত বন্ধক রাখতে চাওয়া সোনার দামের (বাজার দর) ৭৫% পর্যন্ত টাকা ঋণ হিসাবে পাওয়া যায়।
- ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট না থাকলেও এনবিএফসি থেকে এই ঋণ পাওয়া যায়।
- নানা আর্থিক সংস্থা ঋণ শোধের জন্য নানা রকম মেয়াদ বেছে নেওয়ার সুবিধা দেয়। সেই অনুযায়ী সুদ বাড়ে-কমে।

কোথায় যোগাযোগ

প্রায় সব ব্যাঙ্ক স্বর্ণ ঋণ দেয়। তুলনায় বেশি কাগজপত্র লাগে। সময়ও বেশি খরচ হয়। তবে সুদের হার অনেক কম। স্বর্ণ ঋণ নেওয়া যায় এনবিএফসি-র কাছ থেকেও। কাগজপত্র তেমন লাগে না। সময়ও কম লাগে। গয়নার দামের হিসাবের তুলনায় কিছুটা বেশি টাকা ঋণ পাওয়ার সুবিধা পাওয়া যায় এখানে।

কী করতে হবে

(১) যেখানে ঋণ নেবেন, সেখানে গিয়ে জানাতে হবে কী বন্ধক রাখতে চান। সোনার গয়না না বার বা কয়েন। তার ওজন ও মান পরীক্ষা করবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান। (২) এরপর জানাতে হবে কত টাকার ঋণ নিতে চান ও কত দিনের মধ্যে শোধ করবেন। (৩) গ্রাহক যা চাইবেন, ততটাই ঋণ দেওয়া হবে না। বন্ধকী সোনার ওজন ও মান খতিয়ে দেখার পরে যা দাম দাঁড়াবে, তার নির্দিষ্ট অংশ ঋণ হিসাবে পাওয়া যাবে। সাধারণভাবে তা হয় সোনার দামের সর্বাধিক ৭৫%। (৪) এরপর জমা দিতে হবে কেওয়াইসি। নির্ধারিত আবেদনপত্র। সঙ্গে পরিচয়পত্র ও ঠিকানার প্রমাণপত্র।

উইল কেন করবেন?

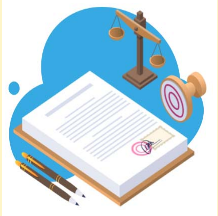

অমিত বর্মণ, আইনজীবী, কলকাতা হাইকোর্ট

উইল বা ইচ্ছাপত্র হল একটা লিখিত দলিল। এই লিখিত দলিলে যিনি উইল করছেন তাঁর সম্পত্তি সম্পর্কে নিজস্ব মতামত বৈধভাবে উল্লেখ থাকে। ভারতীয় স্যাকসেশন অ্যাক্ট ১৯২৫ সালের ৫৯ নং ধারা অনুযায়ী যে কোনো লোক তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি উত্তরাধিকারদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে উইল তৈরি করতে পারেন। এই উইল তাঁর মৃত্যুর পর কার্যকর হয়।

কেন উইল করবেন

কথায় বলে বিষয় মানে বিষ। সম্পত্তি নিয়ে আগামীদিনে ছেলেমেয়ে বা উত্তরাধিকারদের মধ্যে যাতে কোনো আইনি সমস্যা বা জটিলতা না হয় তার জন্য উইল করা হয়।

কে বা কারা উইল করতে পারেন

(১) যে কোনো বয়সের প্রাপ্ত বয়স্ক উইল করতে পারেন।

(২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে তার প্রতিনিধির মাধ্যমে করতে পারেন।

(৩) মূক-বধির, এমনকী অন্ধ লোকও যদি মানসিক ভাবে সুস্থ থাকেন তাহলে উইল করতে পারেন।

(৪) মানসিক দিক থেকে অসুস্থ লোক যখন মানসিক ভাবে সুস্থ তখন উইল করতে পারেন।

(৫) শারীরিক অসুস্থতা, মাদকদ্রব্য সেবন বা অন্য কোনোরকম কারণে মানসিক ভারসাম্য হারালে উইল করতে পারবেন না।

(৬) বিবাহিতা মেয়েরা যদি তাঁর স্বামী জীবিত থাকাকালীন তাঁদের সম্পত্তি অন্যকে দিতে চান, একমাত্র উইল-র মাধ্যমে তা করতে পারেন।

উইলের বিশেষত্ব

(১) ভারতীয় সাকসেশন আইন অনুসারে উইল করার জন্য স্ট্যাম্প ডিউটি দেওয়া বা উইলকে রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক নয়।

(২) উইল করার পর যতবার খুশি বাতিল বা বদল করা যায়।

কীভাবে উইল তৈরি হয়

(ক) ভারতীয় সংবিধানের তপশিলীভুক্ত যে কোনো ভাষায় উইলকর্তা সহজ সরল ভাষায় উইল লিখতে পারেন। অথবা কাউকে বলে দিতে পারেন। (খ) যে কোনো উইলে কমপক্ষে ২ জন সাক্ষী থাকা বাধ্যতামূলক। উইল নিয়ে কোনো জটিলতা দেখা দিলে ওই সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেবেন। (গ) উইলের প্রতি পাতার নীচে ডানদিকে উইল কর্তার সই থাকা চাই। তারিখও জরুরি। (ঘ) বিতর্কিত ক্ষেত্রে উইলকর্তা ও সাক্ষীর সই চাই। (ঙ) যুদ্ধরত সৈনিক বা নৌবাহিনির সেনা যদি মনে করেন তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে বা যুদ্ধক্ষেত্র

থেকে তিনি আর নাও ফিরতে পারেন, সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর উইলের কথা কাউকে বলে যেতে পারেন। একে বলে 'উইল প্রিভিলেজ'। অবশ্য ওই যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে স্বাভাবিকভাবে ফিরে এলে ওই উইল আর গণ্য হবে না। তখন সাধারণ উইল করতে হবে।

উইল সম্পর্কে আরো জরুরি কথা-

(১) কোনো উইলে যদি জাল থাকে বা চুরি করা হয়ে থাকে, তাহলে ওই উইলটি জাল বলে গণ্য হবে।

(২) উইলকর্তা যদি অকৃতদার বা নিঃসন্তান হয়ে তাঁর সম্পত্তি কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা ট্রাস্টকে উইল করে যান, পরে তাঁর উত্তরাধিকার সম্পত্তির উত্তরাধিকার দাবী করে আদালতে যেতে পারেন। বলাবাহুল্য, এমন অনেক নজির রয়েছে।

(৩) যদি উইলকর্তার মৃত্যুর পর উইল চুরি হয়ে যায়, খোওয়া যায়, নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে সাকসেশন আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকাররা আদালত থেকে আদেশনামা নিয়ে উইলের ফটোকপি যদি আনেন ও সাক্ষীর সই দিয়ে প্রত্যয়িত করিয়ে নেন, তাহলে সেই উইল বৈধ বলে গণ্য হবে।

(৪) উইল যে কোনো বয়সে যে কোনো সময়ে করা যায়।

কাছে — দূরে

ঘরের কাছে একটি শিশির বিন্দু অনেকেরই দেখা হয়নি। একদিন-দুদিনেই কেল্লা ফতে। জানাচ্ছেন **সুপর্ন সেন**

গাদিয়াড়া

হুগলি, রূপনারায়ণ ও দামোদর এই তিন ত্রিবেণী সঙ্গমে গাদিয়াড়া। রূপনারায়ণ হুগলি নদীতে মিশে রূপ নিয়েছে সমুদ্রের। পিকনিকের আদর্শ জায়গা। মোটর বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়া যায় মায়াচর, গেঁওখালি। একটু দূরে গড়চুমুক। ইচ্ছে হলে ভেসে বেড়াতে পারেন নৌকায় চেপে। শেষ বিকেলে সূর্যাস্ত অনেকদিন স্মৃতিময় হয়ে থাকবে।

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে ৭৮ কিলোমিটার দূরের গাদিয়াড়া যেতে সময় লাগে ৩ ঘন্টা। ধর্মতলা থেকে সারাদিন সিটিসি বাস পাওয়া যায়। ব্রেক জার্নি করতে হলে বাসে নুরপুর চলে যান, সেখান থেকে লঞ্চে গাদিয়াড়া। বাগনান, উলুবেড়িয়া হয়েও যাওয়া যায় গাদিয়াড়া। থাকার জন্য রয়েছে অনেক রিসর্ট। পর্যটন দফতরের অতিথিশালাও রয়েছে নদীর কাছে।

দেবতার ঘর দুয়ারসিনি

সাঁওতাল, মুন্ডা, শবর প্রভৃতি আদিবাসীদের সংস্কৃতির ক্ষেত্র দুয়ারসিনি। দেবতার ঘর দুয়ারসিনির সৌন্দর্য মনে দাগ কেটে যায়। প্রায় ৩০০ হেক্টর জঙ্গলের মধ্যে বহমান সাতগুরুং নদী, শাল-সেগুনের ছায়ায় মনে শান্তি দেয়। প্যাঙ্গোলিন, নেকড়ে, হায়না এমনকী চোখে পড়তে পারে দুমকার হাতির পাল। ক্লান্ত হলে একটু জিরিয়ে নিতে পারেন হিলটপে। ১৫৫ মিটার উচ্চতার অবস্থিত মনোরম উদ্যান। ঘাটশিলা থেকে ২১ কিলোমিটার। গালুডি থেকে ১৩ কিলোমিটার। পুরুলিয়া থেকে ৭২ কিলোমিটার দূরে আদিবাসীর ভূমি দুয়ারসিনিতে থাকার জন্য রয়েছে সরকারি লজ, ইকো ট্যুরিজম কেন্দ্র।

কীভাবে যাবেন

দুয়ারসিনি যাওয়ার সহজ রাস্তা রেলপথ। হাওড়া থেকে যেতে হবে ঘাটশিলা। সেখান

থেকে অটো বা জিপে দুয়াসিনি। এছাড়া পুরুলিয়া গিয়ে সেখান থেকেও জিপে দুয়ারসিনি যাওয়া যায়।

মাইথন, কল্যাণেশ্বরী

২দিন ছুটি কাটানোর জন্য আদর্শ জায়গা মাইথন। বাংলা ঝাড় খন্ড সীমান্তে বরাকর নদীর ওপর ১৬৫ ফুট উঁচু বাঁধ। ৬৫ কিলোমিটারের জলাধারের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটিতে ৩ ইউনিট ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বরাকর নদীর মাজে ছোটো ছোটো সব দ্বীপ মাইথনের যেন গলার হার। দ্বীপের নাম খুব সুন্দর- সাদাদ্বীপ, সবুজ দ্বীপ, আনন্দ দ্বীপ। ওই সব দ্বীপে রয়েছে শাল,সেগুন, শিশুর ঘন জঙ্গল। নৌকায় চেপে চলে যাওয়া যায় ওই সব দ্বীপে।

গোধূলিবেলায় জলবিহার করলে মনের মণিকোঠায় গেঁথে যাবে এক অপরূপ সূর্যাস্তের স্মৃতি। কাছেই রয়েছে কল্যাণেশ্বরী মন্দির। দূরত্ব মাত্র ২ কিলোমিটার। জায়গার আগের নাম ছিল হ্যাংলা পাহাড়। তৃতীয় শতকে রাজা হরিগুপ্ত কৃষাণদের তাড়া খেয়ে চলে এসে এখানে রাজ্য গড়ে নিজের ইষ্টদেবীর মন্দির করেন। কালের নিয়মে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত। পরে কাশীপুরের মহারাজ কল্যাণ সিংহ এই মন্দিরটা তৈরি করেন। প্রাচীন মন্দির। বাঁধানো চত্বর। গর্ভগৃহে সিঁদুরচর্চিত বেশ বড় একটা ঢিবি । গুহার বাইরে প্রাচীর। নদীর তীরে ছোট্ট মন্দিরে মায়ের পাদপদ্ম। শনি ও মঙ্গলবার মানুষের ঢল নামে। একানে থাকার জন্য রয়েছে অনেক হোটেল ও বাংলো।

কীভাবে যাবেন- হাওড়া থেকে ভোরে ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস ধরে নামতে হবে আসানসোল বা কুমারডুমরি স্টেশন। সেখান থেকে বাস বা অটোয় মাইথন।

উইক এন্ড ট্যুর

সবুজদ্বীপ

হুগলি জেলার বলাগড়ের কাছে বেহুলা ও হুগলি নদীর সঙ্গমে গড়ে উঠেছে সবুজদ্বীপ। আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস, কৃষ্ণচূড়ায় ছাওয়া দ্বীপভূমি পাখিদের কলতানে মুখর। দ্বীপে গড়ে উঠেছে পার্ক, বাগান। রয়েছে নৌকাবিহারের ব্যবস্থা। ফেরার পথে দেকে নিতে পারেন বলাগড় মন্দির। একদিনের বেড়ানো ও পিকনিক স্পটের মনোরম জায়গা সবুজ দ্বীপ।

কীভাবে যাবেন

হাওড়া-কাটোয়া রেলপথে সোমড়া বাজার স্টেশনে নেমে রিক্সায় আসতে হবে সুখরিয়া গ্রাম ফেরিঘাটে। এখান থেকে লঞ্চে সবুজদ্বীপ।

পারমাদান

অচেনা লাগছে? আসলে ইচ্ছামতির তীরে এই নদী অভয়ারন্যের নতুন নাম বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় বন্যপ্রানী সংরক্ষণ কেন্দ্র। ৬৪ হেক্টরের এই বনাঞ্চলে রয়েচে অসংখ্য হরিণ। চাঁদনি রাতে ইচ্ছামতির বুকে নৌকা বা ভটভটিতে বসে উপভোগ করা যায় জঙ্গলের সৌন্দর্য। পরামদান ডিয়ার পার্কে বাঁশ, তুঁত, শিংউল, অর্জুন, শিরিষের ফাঁকে চোখে পড়বে শঙ্খচিল, ফুলটুসির মতো হরেক অচেনা পাখি। রয়েছে চিড়িয়াখানা, শিশু উদ্যান। নদিয়ার পথে নলডুংরি পেরিয়ে ইচ্ছামতীর তীরে এই পারমদান ডিয়ার পার্ক। শিয়ালদহ থেকে যান বনগাঁ। সেখান থেকে রিক্সায় মোতিগঞ্জ। এরপর শহিদ মিনার থেকে পাবেন অনেক সরকারি-বেসরকারি বাস। বারাসাত, বনগাঁ হয়ে চলে যান নলডুংরি। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে বা ভ্যান রিক্সায় মাত্র ৩ কিলোমিটার পারমাদান। বনবিবাগের নিজস্ব ট্যুরিস্ট বাংলোয় থাকার জায়গা রয়েছে।

টুকটাকে বাজিমাত

গৃহস্থালির কাজ করতে গিয়ে অনেক সময়ই আমরা নানাধরনের সমস্যায় পড়ি। কিছু চটজলদি উপায় রয়েছে সেই সব সমস্যা এড়ানোর। রইল সেরকমই কিছু টিপস।

(১) সবজি কাটার সময় বারবার চপিং বোর্ড হড়কে যাচ্ছে? এতে যে কোনো সময় হাত কেটে বিপদ হতে পারে। তাই বোর্ডের নীচে ভেজা তোয়ালে বা ভেজা কাগজ দিয়ে নিন। এতে বোর্ডটা পিছলাবে না।

(২) ফ্রিজে লেবু রেখেছেন। শরবত বানাতে গিয়ে দেখলেন রস কম। তখন উপায়? ফ্রিজে রাখা লেবু থেকে বেশি রস বের করতে চাইলে ১৫-২০ সেকেন্ড মাইক্রোওভেন বা ওভেনে ঘুরিয়েফিরিয়ে লেবুটা গরম করে নিন। দেখবেন লেবু থেকে অনেকখানি রস বের হয়েছে।

(৩) আগে থেকে কষ্ট ও সময় নষ্ট করে আলুর খোসা ছাড়ানোর দরকার নেই। আলু সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর আলুর দুপাশে হাত দিয়ে খুব সহজে খোসা ছাড়িয়ে নিন।

জলই জীবন

মধুমিতা দাস, ছাত্রী

আমার একটা গল্প মনে পড়ছে।

এক বড়লোক বাড়ির কর্তা তার চাকরদের খুব অপমান করতো ও সারাক্ষণ কাজের ভুল বার করতো। দিনের অবসরে একদিন তাঁর আদরের ছেলে একটা অফিসে কাজ করতে ঢুকলো। গ্রামের ছেলে, শহরের অফিসে কাজ করবে। তাই খুব গর্ব তার। সেইসঙ্গে মনে আনন্দ। ছেলে বাড়ি বেড়াতে এলে বাবা জানতে চান, 'তুই কী কী কাজ করিস?' ছেলে বলল, 'বাবা, আমাকে তো পড়াশোনা শেখাওনি, সে জন্য পিওনের কাজ আমার।' বাবা শুনে খুব খুশি। ছেলে বললো, 'বাবা সব কাজ ঠিকঠাক করি তাও সাহেবরা সন্তুষ্ট হয় না বরং গালাগালি দেয়।' বাবা ছেলেকে বললো, 'তোর কাজের জন্যই তো ওরা ভালো আছে, ওদের বুঝিয়ে বলবি।' ছেলে বললো বাবাকে, 'বাবা আমার এই দিনটা তোমার কর্মফল। ভেবে দেখো, তুমি বাড়ির চাকরদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে।'

একদম ঠিক তাই। আমাদের কর্মফল পরের প্রজন্মকে ভোগ করতে হয়। সেটা ভালো বা মন্দ যাই হোক। জল ঠিক এমনই এক জিনিস যা আমাদের পরের প্রজন্মের কাছে সংশয়ের কারণ। আমরা ছেলেবেলায় পড়তাম চেরাপুঞ্জিতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। আজ ভৌগোলিক বিচারের ক্ষেত্রে অনেকটা বদল এসেছে। আমরা সভ্যতার শিখরে উঠতে চাই। সেজন্য নাকি পাহাড় কাটতে হবে, জঙ্গল সাফাই করতে হবে। এসব ভালো কথা। কিন্তু যখন তারা প্রতিহিংসাস্বরূপ আমাদের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তোলে তখন আমরা প্রশ্ন তুলি, কেন এমন হচ্ছে?

খারাপ বা ভালো সবকিছুর জন্য আমরাই দায়ী। আমাদেরই ফল ভোগ করতে হবে। ফিরে আসি কিছু সংখ্যাতত্ত্বে, বিশ্বে ৭১ শতাংশ জল। তার মধ্যে মাত্র ২.৫ শতাংশ বিশুদ্ধ জল আর ৯৭.৫ শতাংশ নোনা জল। এর মধ্যে আবার ৬৯ শতাংশ বিশুদ্ধ জল বরফ ও হিমবাহে থাকে। ৩০ শতাংশ ভূগর্ভস্থ জল। ২৭ শতাংশ বহির্ভাগের জল। সারা বিশ্বের জলের মাত্র ৪ শতাংশ বিশুদ্ধ জল রয়েছে আমাদের এই ভারতে।

অথচ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ লোক এদেশে বসবাস করে। ৭৬ মিলিয়ন লোক পরিষ্কার বিশুদ্ধ জল পায় না। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ভারতে ২০৫০ সালের মধ্যে জল সংকট প্রকট হয়ে উঠবে। ভৌম জলের মধ্যে ২-৩ শতাংশ চাষ আবাদের কাজে লাগে।

আমরা সভ্য হওয়ার জন্য সবরকম সুবিধার কথা ভাবছি। আমরা 'স্মার্ট সিটি' নিয়ে ভাবছি। কিন্তু 'স্মার্ট ভিলেজ' কেন নয়? এটা একটা বড় প্রশ্ন? জল সংকট আমাদের ঠেলে দেবে খাদ্য সংকটের দিকে। আমাদের জীবনযাত্রার সঠিক মূল্যায়ণ হবে না, জীব জগতে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের সমস্যা দেখা দেবে।

সম্প্রতি '২০১৬ ওয়ার্ল্ড ভিশন ওয়াশ ওয়ার্ক' নামে এক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আরো কিছু দেশে এর ব্যবহারিক প্রয়োগ হয়েছে। যেমন, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান। প্রায় ৪৬ মিলিয়ন নতুন লোক এই সুবিধা পেয়েছে। ওই ঘোষণায় ২০১৭ সালে সব লোক ১০ সেকেন্ডে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাবেন এমন পরিকল্পনা করা হয়।

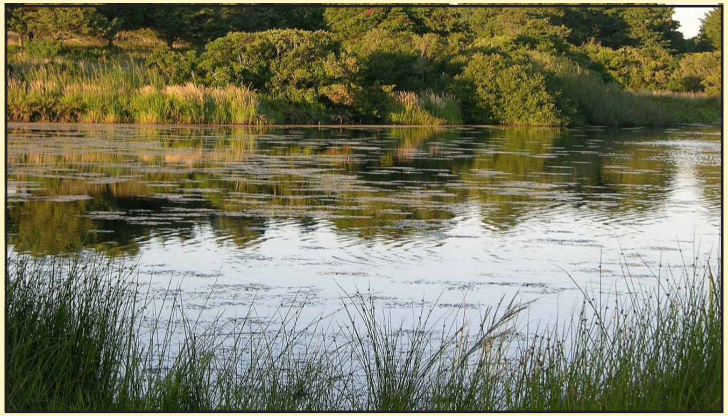

২০১৮-২০৩০ : ভিশন-গ্লোবাল ওয়াটার ওয়ার্ক। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ২০ মিলিয়ন লোককে বিশুদ্ধ জল পৌঁছে দেওয়া ২০২০ সালের মধ্যে। অন্যদিকে, ৫০ মিলিয়ন লোককে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশুদ্ধ জল পৌঁছে দেওয়া।

আমাদের সচেতনতাই আমাদের বাঁচাতে সাহায্য করবে। এই মুহূর্তে জল বাঁচাতে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ, জলই জীবন।

জঙ্গিপুর নিয়ে দু'চার কথা

সৃঞ্জয় ঠাকুর

আমার ছেলেবেলায় যখন দেশের বাড়িতে যেতাম,তখন বন্ধুরা জানতে চাইলে বলতাম জঙ্গিপুরে যাবো তাতে ওরা আমাকে রাগাতো। সেই থেকেই আমার মনে প্রশ্ন জাগতো কেন এই রকম নামকরণ। বড়ো হওয়ার পর বুঝেছি যে কোনো নামকরণের পিছনে একটা করে গল্প থাকে। এমনও দেখা যায়-শব্দের অপভ্রংশে আসল নামটাই লোক ভুলতে বসেছে। যাই হোক জঙ্গিপুর ও তার নামকরণ নিয়ে কিছু কথা জানতে পেরেছি, আর সেটাই আপনাদের বলছি।

দিল্লির সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় বাংলার সুবেদার ছিলেন মানসিংহ। তাঁর সময় ওই অঞ্চলের নাম হয় জাহাঙ্গীরপুর। পরে তা থেকেই জঙ্গিপুর নাম হয়েছে।

জঙ্গিপুরের নামকরণ নিয়ে আরো একটা মত রয়েছে। জঙ্গি শব্দটা আসলে ফরাসি। যার মানে হল সামরিক বা লড়াকু। তাতেই অনুমান করা হয়, জঙ্গি শিবির বা সেনা ছাউনি থাকার সুবাদে এর নাম হয়েছে জঙ্গিপুর। নবাবি আমলে এই জঙ্গিপুর মহকুমায় ১৭৪০ ও ১৭৬৩ সালে দুটি যুদ্ধ হয়। ঐতিহাসিকদের মতে, গিরিয়া মুর্শিদাবাদের পানিপথ নামে পরিচিত।

বিন্ধ্য পর্বত ভারতের পশ্চিম থেকে পূর্বে শেষ হয়েছে। গঙ্গা হিমালয় থেকে উৎপত্তি হয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে সাগরমুখী এসেছে। বিন্ধ্য পর্বতের কোণ ছুঁয়ে সমতলে পড়েছে। সেটাই রাজমহল। সেখান থেকে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর শুরু। অবশ্য এখন রাজমহল ঝাড়খণ্ডের অংশ। সাঁওতাল বিদ্রোহের পর সাঁওতালদের উপনিবেশের সুবিধার জন্য রাজমহলকে কেন্দ্র করে দামিন কো অঞ্চল হয়। তখনই মুর্শিদাবাদ থেকে আলাদা হয়ে যায়। গঙ্গা রাজমহলের পরেই পদ্মা ও ভাগীরথীর দুটি ধারায় ভাগ হয়েছে। ভাগীরথীর দুই তীর ধরে মুর্শিদাবাদ হয়েছে। উত্তরে হল জঙ্গিপুর।

বিন্ধ্য পর্বতের শেষের অংশ ঝাড়খণ্ড পাহাড়। তারপরে বাংলার পাহাড়ি অঞ্চল থেকে জঙ্গিপুর শুরু। এদিকে, জঙ্গিপুরের পাহাড় লাগোয়া অঞ্চল বীরভূমে ঢুকে গেছে।

আগে বীরভূম অঞ্চলটা ছিল রাজার দখলে। বাংলা, বিহার কিংবা ওড়িশার নবাবের নয়। ইংরেজদের শাসনে বীরভূমও ইংরেজদের দখলে গেল। তখন থেকেই নগদে জমির খাজনা নেওয়া শুরু হয়। এরসঙ্গেই শুরু হয় ভূমির পুনর্গঠন। রামপুরহাট ও কান্দির অঞ্চল অদলবদল হয়।

জঙ্গিপুর বন্দর শহর হয়ে ভাগীরথীর পূর্ব তীরে গড়ে ওঠে। পুরসভা গঠন হলে নদীর দুই তীরের জনপদ নিয়ে জঙ্গিপুর শহর হয়। ঝাড়খণ্ডের পাহাড় আসলে আগ্নেয়গিরির লাভা থেকে সৃষ্টি। ঝাড়খণ্ডের শেষ অংশ ও ভাগীরথীর এই অঞ্চলটা আগ্নেয়গিরির ছাই থেকে ধীরে ধীরে মাটি হয়। পাহাড় থেকে পশ্চিম থেকে পূর্বে অনেক নদীও গড়ে উঠেছে। মোটামুটিভাবে ৫০ কিলোমিটার লম্বা সব ক'টি নদীই।

এই অঞ্চল ছাই মাটির হলেও উর্বর। সবজি, মশলা, ডাক খুব বেশি চাষ হয়। তবে এই আগ্নেয়গিরি কত হাজার বছর আগের তার সঠিক ইতিহাস জানা নেই।

ভাগীরথীর তীর অঞ্চল অবশ্য পলিমাটির। তার পশ্চিমে বিল। তারও পশ্চিমে শক্ত রাঢ় মাটি। আর একটু পশ্চিমে পাহাড়ি পাথর মাটি। এই পাথরে মাটিতে অনেকরকম খনিজ ধাতু রয়েছে। লৌহঘটিত লাল পাথর, কালো কয়লা, সাদা চুন ইত্যাদি।

ভাগীরথীর তীরে রয়েছে সরস মাটি। সবজি, ফল অনেক কিছু চাষ হয়।

হেঁসেল

রকমারি রান্না নিয়ে হেঁসেলে হাজির নীলাঞ্জনা

ভিনরাজ্যের রান্না

কাবুলি

উপকরণ- বাসমতী চাল ৫০০ গ্রাম, ছোলার ডাল ৫০ গ্রাম, পেঁয়াজবাটা ১ বড়ো চামচ, আদাবাটা ১ চামচ, রসুনবাটা ১ চামচ, পোস্তদানা ১ চামচ, কাজু ১০০ গ্রাম, কিশমিশ ৫০ গ্রাম, আলু খোসা ছাড়িয়ে গোল পাতলা টুকরো করে কাটা ২০০ গ্রাম, হলুদগুঁড়ো আধচামচ, গরমমশলা গুঁড়ো ১ চামচ, ঘি ৪ চামচ, নুন স্বাদমতো, লঙ্কাগুঁড়ো দরকার মতো, এছাড়া লাগবে চাঁদির তবক।

কীভাবে তৈরি করবেন-

প্রথমে কড়াইতে ঘি গরম করে তাতে কাজু, কিশমিশ ভেজে নামিয়ে রাখুন। এরপর আলুর গোল গোল টুকরো লাল করে ভাজুন। কুকারে ৪ বড়ো চামচ ঘি গরম করে পেঁয়াজ, রসুন, আদাবাটা দিয়ে ভাজুন। এতে অর্ধেক ছোলার ডাল, কাজু, পোস্তদানা, কিশমিশ ঢেলে চাল দিন। চাল মুচমুচে হলে আধ লিটার জল ঢেলে ঝরঝরে পোলাও বানিয়ে নিন। এবার পোলাওয়ের চারদিকে আলুর স্লাইস সাজিয়ে ওপর থেকে ভাজা কাজু, কিশমিশ ও তবক দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

গোলাপী মাংস

উপকরণ- এটা আসলে রাজস্থানি রেসিপি। তৈরি করতে লাগবে ১ কিলো মটন, দই ২ কাপ, ঘি ২-৩ কাপ, টমেটো ১টা, পেঁয়াজ ১টা কুচো করা, রসুনকুচি ৮ থেকে ১০টা, শুকনো লঙ্কা ৮-৯টা, গোলমরিচ ১ চামচ, জিরে ১ চামচ, পোস্তদানা ৩ চামচ, কাজু হাফ কাপ, নুন স্বাদমতো।

কীভাবে তৈরি করবেন-

পোস্ত, কাজু, জিরে, শুকনো লঙ্কা, গোলমরিচ একসঙ্গে মিহি করে বেটে নিন। এবার কড়াইতে ঘি গরম করে তাতে পেঁয়াজ, রসুন বাটা মশলা ও দই ঢেলে কষুন। মশলা ও ঘি ছেড়ে দিয়ে ভালো করে মাংস কষুন। দরকারমতো জল দিয়ে প্রেসারে সিটি দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে ওভেন থেকে নামিয়ে টমেটো, পেঁয়াজের স্লাইস ছড়িয়ে দিন।

চোখে পড়া সুন্দরী

নাইবা পেলেন বনলতা সেনের পাখির নীড়ের মতো চোখ কিংবা মুখে শ্রাবস্তীর কারুকার্য। কিন্তু সামান্য রূপচর্চায় আপনি হয়ে উঠতে পারেন চোখে পড়ার মতো সুন্দরী। কীভাবে তা সম্ভব লিখছেন **অনুমিতা**।

অতিরিক্ত গরমে ত্বক আর্দ্রতা হারায় ও শুষ্ক হয়ে পড়ে। জন্মগতভাবে ত্বক তিন ধরণের। স্বাভাবিক, শুষ্ক ও তৈলাক্ত ত্বক। রোদ ও ধুলোবালি সতেজ ত্বকের বড়ো শত্রু। রোদের পোড়াভাব ত্বকে খুব তাড়াতাড়ি বসে যায়। লোমকূপে ময়লা জমে মুখে ব্রণ হয়। রোদের ছোপদাগ পড়ে ত্বক রুক্ষ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ঘাম থেকে ঘামাচিসহ নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার কখনো কখনো র‍্যাশও হতে দেখা যায়। ত্বক শুষ্ক হলে ত্বকের নমনীয়তা কমে যায়, আর নমনীয়তা কমে গেলে ত্বকে ফাটল ধরে ও চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ ফুটে ওঠে।

গরমে ত্বকচর্চার দরকারি কথা

(১) গরমে মাত্রারিক্ত ঘামাচি হলে নিমপাতার রস লাগান, উপকার পাবেন। তেতো জাতীয় খাবার খান। ঘাম বেশি হলে ট্যালকম পাউডার ব্যবহার করুন।

(২) গরমে ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে। ত্বক তৈলাক্ত হলে বারবার মুখ পরিষ্কার করতে হবে। শশা ও মুসুরি ডাল বাটা পেস্ট করে মুখে লাগিয়ে ১৫ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। মুখের তেলতেলেভাব কেটে যাবে।

(৩) গোলাপের পাপড়ি, খেজুর, দুধে ভিজিয়ে রাখুন ২ থেকে ৩ ঘণ্টা। একসঙ্গে পেস্ট করে চন্দনের গুঁড়ো মিশিয়ে ত্বকে লাগিয়ে রাখুন। পরে ঠান্ডা জলের সাহায্যে ধুয়ে ফেলুন, ত্বক মসৃণ হবে। এছাড়া কমলালেবুর রস ভলো ময়েশ্চারাইজারের কাজ করে। এর সঙ্গে দুধ ও ময়দা মিশিয়ে মুখের ত্বক পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার করতে পারেন। অতিরিক্ত খসখসে ভাব থাকলে রাতে ঘুমানোর সময় ত্বক পরিষ্কার করে পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকে লাগিয়ে ম্যাসাজ করুন। সকালে ধুয়ে ফেলুন, উপকার পাবেন। সারা বছর এটা ব্যবহার করতে হবে।

(৪) লাউয়ের রস, তরমুজের জুস বরফ হিসেবে তৈরি করে মুখে ঘষুন। এতে রোদে পোড়াভাব দূর হয়ে সঙ্গে সঙ্গে আপনার ত্বক হয়ে উঠবে উজ্জ্বল জেল্লাদার ও মোলায়েম।

(৫) গরমে তৈলাক্ত ত্বক তাড়াতাড়ি ঘেমে যায় ও ময়লা দ্রুত শুষে নেয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে শশার রস পরিমাণমতো, আধা চা-চামচ লেবুর রস, আধ চামচ গোলাপ জল মিশিয়ে লোশনের মতো মুখে লাগিয়ে ৩০ মিনিট পরে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে অন্তত ৪ থেকে ৫ দিন এটা ব্যবহার করুন।

(৬) গরমে অনেকের ত্বকে হিট র‍্যাশ বের হয়। হিট র‍্যাশ এড়াতে দইয়ের সঙ্গে হলুদ বা নিমপাতা বাটা মিশিয়ে ত্বকে লাগাতে পারেন। এছাড়া খানিকটা লাউ থেতো করে তুলসিপাতা ও চালের গুঁড়ো মিশিয়ে লাগাতে পারেন। এতে র‍্যাশ হবে না, আবার ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়বে।

(৭) গরমে ব্রণের মাত্রা বেড়ে যায়। ব্রণ এড়াতে সপ্তাহে তিন, চার বার চিরতার জল ও দু-তিনটে কাঁচা হলুদ ও আখের গুড় খেতে পারেন। সবসময়ে মুখ পরিষ্কার রাখবেন।

কীভাবে হবেন স্মার্ট শপার

সংসার চালাতে খরচ করতে হয়। কিন্তু এদিক থেকে ওদিকে একটু বেশি খরচ হলে সমস্যায় পড়তে হয়। ফলে খুব হিসাব করে খরচা করতে হবে। আর এটাকেই বলে স্মার্ট শপিং। জেন নিন কীভাবে কেনাকাটা করলে আপনি হয়ে উঠবেন স্মার্ট শপার।

- মাসের প্রথমে একটা তালিকা তৈরি করে ফেলুন, যেখানে থাকবে আপনার কী কী লাগবে। দোকানে গিয়ে আপনার একটা জিনিস ভালো লাগলে আপনি কিনে ফেললেন। তা আপনার আদৌ দরকারে লাগবে কিনা, তা নিজেই হয়তো জানেন না। তাই কোনো জিনিস কেনার আগে দু'বার ভাবুন। দোকানে গিয়ে সুন্দর সাজানো গোছানো জিনিস দেখে প্রভাবিত হবেন না।

- আজকাল শপিংমলে বিশেষ ছাড়ে জিনিসপত্র দেওয়া হয়। ওই সব জিনিস কেনার আগে পরখ করে দেখে নিন। কারন অনেক সময় ওজন কমিয়ে বিক্রি করা হয়। তাই ওজন দেখে নিন। আবার অনেক সময় অফারে জিনিস দেওয়া হয়। একটা কিনলে আর একটা দেওয়া হয় নিখরচায়। ওই সব জিনিস কিনতে পারেন। এতে আপনার টাকা কিছুটা হলেও বেঁচে যাবে।

- কেনাকাটা হয়ে গেলে টাকা দেওয়ার আগে একবার আপনার সব কেনা জিনিস দেখে নিন। কোনো কিছু ফেলে আসছেন কিনা বা অপ্রয়োজনীয় কিছু কিনেছেন কিনা। এমন জিনিস থাকলে ব্যাগের বাইরে রেকে দিন। এতে দেখবেন আপনার খরচ কমেছে।

- মহিলারা পোশাক ও গয়নার প্রতি খুব দুর্বল। পছন্দ হলে ভাবনা-চিন্তা করেন না। অথচ ভেবে দেখেন না ওই পোশাক ও গয়না তাঁকে মানাবে কিনা। ফলে পোশাক ও গয়না কেনার আগে ভেবে দেখুন তা আপনার মানাবে কিনা বা কেনার সামর্থ রয়েছে কিনা। ধার করে কোনো জিনিস কেনার চেষ্টা করবেন না।

স্বামী বিবেকানন্দের কুমারী পুজো

১৮৯৮ সাল।

চিকাগো থেকে ফেরার পর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। স্বামীজী বসে আছেন বেলুড় মঠের গঙ্গার তীরে। শীতের বিকেলের শেষ রোদ গঙ্গার ঢেউয়ের বিভঙ্গে লুকোচুরি খেলছে তখন।

স্বামীজীর পাশেই বসে আছেন, তাঁর বিদেশীনী শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা। নৈস্বর্গীক নিস্তব্ধতা ভেঙে, জলদগম্ভীর কণ্ঠে স্বামীজী বলে উঠলেন- না, সিস্টার। এই ভাবে বসে বসে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না।

সিস্টার : বলুন স্বামীজী কি করতে হবে?

স্বামীজী : সারা পৃথিবীকে আমি ভারতীয় দর্শন তো বোঝালাম। কিন্তু নিজে কি আজও ভারত মা'কে জানা চেনার চেষ্টা করেছি? ভাবছি পায়ে হেঁটে আমি ভারত মা'কে দর্শন করবো। তুমি কি পারবে আমার সঙ্গে যেতে?

সিস্টার : এ তো আমার পরম সৌভাগ্য স্বামীজী। এই দেশটাকে আমি আমার নিজের দেশ ভেবে সব ছেড়ে চলে এসেছি। এই দেশকে চেনা জানার সৌভাগ্য আমি অর্জন করতে চাই। যত কষ্টই হোক, আমি আপনার সঙ্গে যাব স্বামীজী।

যেমন ভাবনা, তেমন কাজ।

দক্ষীণের কন্যাকুমারিকা থেকে শুরু হল পায়ে হেঁটে ভারত দর্শন। গন্তব্য উত্তরের কাশ্মীর উপত্যকা। টানা প্রায় ৬ মাস পথ চলে, অক্টোবরে স্বামীজী পৌঁছোলেন কাশ্মীর। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর তখন প্রায় চলছে না, একটু বিশ্রাম চাইছে। উপত্যকার একটা ফাঁকা মাঠের পাশে একটা পাথরের খণ্ডের ওপর বসে ক্ষণিক বিশ্রাম নিচ্ছেন স্বামীজী। সামনের মাঠে খেলা করছে কয়েকটি স্থানীয় শিশু কিশোর।

একটি বছর পাঁচেক শিশুকন্যাও তাদের মধ্যে রয়েছে। ওই কন্যাটির দিকে একদৃষ্টে দেখছেন স্বামীজী।

কন্যাটির মা, তাঁর মেয়েকে ডেকে, একটি পাত্র করে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। মেয়েটিও খাবারটি সবে মুখে তুলতে যাবে, এমন সময়ে আরো দূর থেকে আরো ছোটো একটি ছেলে চিৎকার করে নিজের ভাষায় কিছু একটা বলতে বলতে মেয়েটির কাছে ছুটে এল।

মেয়েটি নিজের মুখের খাবারটা রেখে দিলো আবার পাত্রের মধ্যে। খাবার সমেত পাত্রটি এগিয়ে দিলো ওই ছেলেটির দিকে।

স্বামীজীও উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চিৎকার করে বললেন, সিস্টার আমি পেয়ে গেছি।

সিস্টার : কি পেলেন স্বামীজী?

স্বামীজী : মা দুর্গাকে পেয়ে গেছি। ভারত মা কে খুঁজে পেয়েছি।

স্বামীজী : ওই দ্যাখো সিস্টার। যে মেয়েটা নিজের মুখের খাবার, হাসতে হাসতে ভাইয়ের মুখে তুলে দিতে পারে, যুগ যুগ ধরে সেই তো আমার মা দুর্গা। সেই তো আমার ভারত মাতা।

স্বামীজী : সিস্টার। তুমি পুজোর উপকরণ সাজিয়ে ফেল। আগামীকাল দুর্গাপুজোর অষ্টমীতে এই মেয়েটিকে আমি ক্ষীর ভবানী মন্দিরে, দুর্গার আসনে বসিয়ে কুমারী পুজো করবো। আমি যাচ্ছি মেয়েটির বাবার সঙ্গে কথা বলতে।

হঠাৎ স্বামীজীর রাস্তা আটকে দাঁড়ালেন কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাশ্মীরী পণ্ডিত। স্বামীজী আপনি দাঁড়ান।

পণ্ডিতরা : স্বামীজী, আপনি না জেনে বুঝেই ভুল করতে যাচ্ছেন। ওই মেয়েটিকে আপনি কখনোই দুর্গা রূপে পুজো করতে পারেন না। ওর জন্ম মুসলমান ঘরে। ওর বাবা একজন মুসলমান শীকারা চালক। ও মুসলমানের মেয়ে।

স্বামীজীর কান দুটো লাল হয়ে গেছে। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। গম্ভীর গলায় স্বামীজী বললেন, আপনারা আপনাদের মা দুর্গাকে হিন্দু আর মুসলমানের পোশাক দিয়ে চেনেন। আমি আমার মা দুর্গাকে অন্তরাত্মা দিয়ে চিনি। ওই মেয়েটির শরীরে হিন্দুর পোশাক থাক বা মুসলমানের পোশাক, ওই আমার মা দুর্গা। আগামীকাল ওকেই আমি দুর্গার আসনে বসিয়ে পুজো করবো।

পরের দিন সকাল। দুর্গাপুজোর অষ্টমী। ক্ষীর ভবানী মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে, শাঁখ বাজছে। মুসলমানের মেয়ে বসে আছে দুর্গা সেজে। পুজো করছেন হিন্দুর সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ। পুজোর উপকরণ সাজিয়ে দিচ্ছেন খ্রিস্টান ঘরে জন্ম নেওয়া ভগিনী নিবেদিতা।

এই হল মহামানবের দুর্গা পুজো। এই হল মানবিকতার দুর্গা পুজো। মা আমাদের সবার। জাত ধর্ম নির্বিশেষে সবার। মা-র কোনো জাত ধর্ম নেই, থাকে না।

কল্যাণী কাজী চান নজরুলগীতিতে মূল সুর ও গায়কী ঠিক থাক

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রায় ৯০ ছুঁই ছুঁই বয়সে ও গান শুনে, গান শিখিয়ে ও লেখালেখি করে সময় কাটান কাজী নজরুল ইসলামের পুত্রবধূ সঙ্গীত শিল্পী কল্যাণী কাজী। বয়সের ভারে ক্লান্ত ও শারীরিক ভাবে কিছুটা অসুস্থ কিন্তু মনের দিক থেকে এখনো আগের মতো সতেজ ও সবুজ। স্মৃতিশক্তি অটুট। কথা বলতে গিয়ে ফিরে গেলেন হারানো সব দিনে।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছিল নাচ, গান, আবৃত্তির প্রতি আগ্রহ। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান, তাই বাধ্যবাধকতা ছিল না। তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ‘প্রভাতী’ আবৃত্তি করেন। সেদিন থেকে কাজী নজরুল ইসলাম হয়ে ওঠেন তাঁর প্রিয় কবি। পরে গানের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। গান শেখেন ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের কাছে। ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র ছিলেন নজরুলের প্রিয় শিষ্য। কল্যাণী কাজী জানান, ‘গুরুজী আমাকে প্রথম যে গানটা শিখিয়েছিলেন তার প্রথম লাইন ছিল, ‘আজও কাঁদে কাননে কোয়েলিয়া’। হাম্বীর রাগাশ্রিত গানটার রচয়িতা ও সুরকার ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।’

পরে নজরুলের কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধের সঙ্গে গানের মাধ্যমে কল্যাণীর প্রথমে পরিচয়, পরে ২ জনে বিয়ে করেন। কল্যাণীর কথায়, আমিই ছিলাম প্রথম পুত্রবধূ। শ্বশুর বাবা ও শাশুড়ি মা দুজনে অসুস্থ। পরিবারে প্রাচুর্য ছিল না, কিন্তু আনন্দ ছিল। শ্বশুর বাবা মানসিক ভাবে অক্ষম হলেও শারীরিকভাবে সুস্থ ছিলেন। সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াতেন। আবার ক্লান্ত হলে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় শুয়ে পড়তেন। শাশুড়ি মায়ের শরীরের নীচের অংশ কোমর থেকে অবশ হয়ে গিয়েছিল। শরীরের ওপরের অংশ সুস্থ ছিল। অল্প উঁচু একটা চৌকিতে শুয়ে পাশ ফিরে এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় বাবাকে খাইয়ে দিতেন, সবজি কাটতেন, আমাদের খেতে দিতেন। প্রতি বছর ঘটা করে বাবার জন্মদিন পালন করা হত। প্রচুর লোকজন আসতেন। নিজে গান গাইতে পারতেন না কিন্তু ইশারায় কী যেন বলতেন। শ্বশুর বাবা যখন হারমোনিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাসিমুখে শব্দ করে তাকাতেন, তখন বুঝতাম গান শুনতে চাইছেন। গান শুরু করলে শব্দ করে হাসতেন।

নজরুলের গান প্রথমে নজরুলগীতি নামে প্রচারিত হয়নি। তখন আকাশবাণীতে অনুরোধের আসরে রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের গানের মধ্যে ‘ভালো বাংলা গান’ বলে তাঁর গান সম্প্রচার হত। যেমন, ‘কাবেরি নদীজলে কে গো-’ সুপ্রভা সরকারের গাওয়া। আবার ‘নয়ন ভরা জল গো তোমার-’ সত্য চৌধুরীর গাওয়া। কল্যাণী কাজী জানান, তখন ফিরোজা বেগম, কমল দাশগুপ্তরা নজরুল ইসলামকে গান শোনাতে আসতেন। আসতেন কল্পতরু সেনগুপ্ত। তাঁরা ভাবলেন, আরে, গানে এত বৈচিত্র, এত বৈশিষ্ট। এই গান আলাদা নামে পরিচিত হওয়া উচিত। নজরুল জন্মজয়ন্তী নামে একটা সংস্থা করে ওঁরা নজরুলগীতি নাম আদায় করেছিল। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে এটা হয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাঁধা নিয়মে যেমন বিশ্বভারতী কড়া নজর রেখেছিল, নজরুলের গানের ক্ষেত্রে তেমন হয়নি কেন? কল্যাণী কাজী জানান, নজরুলগীতি নামে আলাদা করে যখন বাবার গান পরিচিতি পেল তখন গানের চাহিদাও আচমকা বেড়ে গেল। সংরক্ষণের জন্য বাবার আশেপাশের কেউ উদ্যোগ নেয়নি। কাজী

বিতর্কিত বিষয় পরিচালক কঙ্গনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বলিউডের বিতর্কিত নায়িকা কঙ্গনা রানাউত। তাঁকে কেন্দ্র করে সব সময়ে বিতর্ক চলতে থাকে। তিনি সোশাল মিডিয়ায় কিছু লিখলেই তা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। আর এই কারণে কিছু দিন আগে ট্যুইটার কর্তৃপক্ষ তাঁর ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। ১৯১৯ সালের ২৫ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছিল ঝাঁসির রাণি লক্ষ্মীবাঈ-এর জীবনী অবলম্বনে কঙ্গনা রানাউত অভিনীত হিন্দি সিনেমা ‘মনিকর্ণিকা’, ‘দি ক্যুইন অফ ঝাঁসি’। ওই সিনেমায় শুধু অভিনয় নয় সিনেমার বেশ কিছু অংশের পরিচালকও ছিলেন তিনি। বলিউডের নায়িকা এবার পরিচালকের ভূমিকায়। সিনেমার বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছেন এই দেশের এক বিতর্কিত বিষয়। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জারি করা ‘জরুরি অবস্থা’ নিয়ে তাঁর সিনেমা ‘ইমারজেন্সি’। প্রধান ভূমিকায় নিজেই অভিনয় করছেন। অভিনেত্রী কঙ্গনা জানান, এই সিনেমা পরিচালনার জন্য তিনি গত এক বছর ধরে গবেষণা করে চলেছেন। ‘ইমারজেন্সি’ কোনো ভাবেই ইন্দিরা গান্ধীর জীবনীমূলক সিনেমা নয়। এটা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জীবনের একটা অংশের ঘটনামাত্র।

এ দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় ১৯৭৫ সালে ও জারি ছিল ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত। ফলে এ বছর জরুরি অবস্থার ৪৬ বছর। এখন দেখার ৩৪ বছরের এক নায়িকা পরিচালকের আসনে বসে বিতর্কিত বিষয় নিয়ে কি ধরনের সিনেমা তৈরি করেন।

---

২৯ পাতার পর

অনির্বাণ বাবার গানের ৩টে স্বরলিপির বই বের করেন- সুরলিপি, সুরমুকুর ও নজরুল স্বরলিপি। একটা তিনি নিজে বের করেছিলেন আর বাকিটা তাঁর সহযোগী যাঁরা ছিলেন, তারা বের করেন।

নজরুল চর্চা নিয়ে ওপার বাংলার সঙ্গে এপার বাংলার তুলনা টানতে পছন্দ করেন না নজরুল পুত্রবধূ। বাংলাদেশে রয়েছে নজরুল ইনস্টিটিউট। আমাদের রাজ্যেও মুখ্যমন্ত্রী করেছেন নজরুল তীর্থ ও নজরুল আকাদেমি। ২ বাংলার শিল্পীদের মধ্যে একটা সুর-বির্তক রয়েছে। আধুনিক গানের শিল্পীরাও এখন নজরুলগীতি গান। সিনেমায় ব্যবহার হয়। কল্যাণী কাজী জানান, আঙ্গুরবালা দেবী, ইন্দুবালা দেবী, ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, ফিরোজা বেগম প্রমুখরা সরাসরি কাজী নজরুল ইসলামের কাছে গান শিখে গাইতেন। তাঁদের গান গাওয়ার স্টাইল হয়তো আলাদা ছিল। আগে একটা আলাপ দিতে হত। পরে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেলডি আনা হল। আজকের অনেকে খুব কায়দা করে গান ঠিকই কিন্তু কায়দার গান গাইতে গেলে গায়কি ঠিক রাখতে হয়। যা সবার গলায় আসে না। তাঁর মতে, মূল সুর ঠিক রেখে ও গায়কী বজায় রেখে নজরুলের গান গাওয়া উচিত।

গায়িকা ছাড়াও কল্যাণী কাজী একজন সুলেখিকা। শ্বশুর নজরুল ইসলামের অন্য জীবন নিয়ে লিখেছেন অন্তরঙ্গ নজরুল, তেমনি শাশুড়ী প্রমীলাদেবীকে নিয়ে লেখিছেন। তাঁর জীবন দেবতা কাজী নজরুল ইসলাম। কথার ফাঁকে নজরুল পুত্রবধূ গুনগুন করে গাইলেন তাঁর প্রিয় গান, আমি চিরতরে দুরে চলে যাব, তবু আমারে দেবো না ভুলিতে।